Vol. 30 | No. 3 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা কবিতার ক্লান্তি-পর্ব : শায়ের ও কবিওয়ালা

Volume	30
Issue	3
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাইদুর রহমান ভূঁইয়া
Published online	June 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i3.2
Pages	37-68
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা কবিতার ক্রান্তি-পর্ব : শায়ের ও কবিওয়ালা

সাইদুর রহমান ভুঁইয়া

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত পরাধীনতার প্রথম একশত বৎসরের ঘটনাবলী বাংলাদেশের জন্য তো অবশ্যই, সমগ্র উপমহাদেশের অনাগত ভবিষ্যতের জটিল ও মানবতা-বিরোধী দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় দুর্ভাগ্যের নিয়ামকরূপে বর্তমানকালের পাঠকের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যে, সঙ্গতকারণেই পুনর্বিবেচিত হওয়া অত্যাবশ্যিক হয়ে পড়েছে। কারণ রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এ-সময়টা ছিল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগপৎ এক ক্রান্তি পর্ব ও সন্ধি যুগ। অর্থাৎ মধ্যযুগ থেকে আধুনিকতায় উত্তরণে অবক্ষয়, বিবর্তন ও প্রস্তুতির যুগ। তবে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতার পতন হলেও বিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হতে সময় লেগেছিল প্রায় আরো পঞ্চাশ বৎসর (মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে সময়টা অবশ্যই খুব সামান্য)। পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাদের মনে যেমন, তেমন তাদের এদেশীয় সহায়কদের মনেও, সঙ্গত কারণেই সংশয় ও শঙ্কা ছিল। কেননা, 'প্রথম প্রথম এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরেজরা এদেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবে কিনা? পলাশীর যুদ্ধে তাহারা দেশ জয় করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে অন্তর্বিদ্রোহ চলিল। :..বিগত শতাব্দীর (উনিশ শতক) প্রারম্ভ হইতেই এদেশীয়গণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ইংরেজ রাজা স্থায়ী হইল এবং তাহাদিগকে এই নব রাজ্যের ও নূতন রাজাদিগের প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হইতে হইবে।'[১] বাংলাদেশে উল্লিখিত কালের ইতিহাস পাঠকদের কাছে অবশ্যই বোধগম্য যে, উদ্ধৃতাংশের অন্তর্বিদ্রোহ বলতে লেখক উক্ত সময়ের বিজিত ও পর্যুদস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ-প্রতিরোধকেই বুঝাতে চেয়েছেন এবং 'এদেশীয়গণ' বলতে অপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদী উচ্চাভিলাষী শ্রেণীকেই বুঝিয়েছেন। স্বভাবতই

পরাধীনতার প্রথম অর্দ্ধশতাব্দী কোম্পানী রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয়িত এদেশীয় উন্নত শ্রেণীর মধ্যে নানারূপ সন্দেহ-শঙ্কায় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ ছিলনা এবং কোন সাহিত্যিক প্রতিভারও আবির্ভাব ঘটেনি। অপরদিকে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেও প্রথম অর্দ্ধ-শতাব্দী পর্যন্ত ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীও খুব শঙ্কা-মুক্ত ছিলনা। এ সময়ে এ দেশের এক শ্রেণীর মধ্যে একটা নতুন সম্ভাবনার আশা-নৈরাশ্যের উদ্বেগে, অপরদিকে অপর শ্রেণীর পরাভূত, ক্ষুব্ধ মানসিকতার ব্যর্থ বিদ্রোহ-বিপ্লবের বিষাদে ও আক্রোশে সমগ্র দেশে এক চরম থম্‌থমে অবস্থা বিরাজমান। এরূপ অবস্থায় চতুর ইংরেজ ধীরে চলো নীতি অবলম্বনে অতি সতর্কতার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে স্বীয়-শক্তি বৃদ্ধি করেছে, অতি কৌশলে একের পর এক জনপদ অধিকার করেছে, এবং দিল্লীর বিলাস-প্রিয়, অক্ষম বাদশাহের নিকট থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদের অধিকার (১৭৬৫) ও কর্তৃত্ব-বলে কখনো শক্তি প্রয়োগে বিদ্রোহ দমন করেছে, কখনো ত্বরিত নতুন নতুন আইনের ব্যবস্থাধীনে একের পর এক এদেশের বিজিত মুসলিম ধর্মাবলম্বী ভূস্বামী, জমিদার, জায়গীর-দার ও রাজকর্মচারী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, তন্তুবায়, কৃষক-শ্রমিক পর্যন্ত সকল পেশার মুসলমানের ধন-জন, সহায়-সম্পদ হরণ, শক্তি-সামর্থ্য, মান-সম্মানের পূর্বতন সামাজিক ও দৈশিক অবস্থান থেকে পদচ্যুৎ অবনমন, এবং অপর ধর্ম-সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করনের ব্যাপক তৎপরতায় ব্যাপৃত ছিল।[২] সঙ্গত কারণেই বিজিত মুসলিম সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই এ সময়টা ছিল অকস্মাৎ সায়াহ্নকালীন বিপর্যয়ের সন্নিপাতে বিমূঢ় ও বিক্ষুব্ধ। অপরদিকে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহধন্য, সুযোগ-সন্ধানী ও উচ্চাভিলাষী অপর সম্প্রদায়ের জন্য এ সময়টা ছিল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় আশাব্যঞ্জক। অতএব সুসময়ের অপেক্ষমান শ্রেণীর জন্য পরাধীনতার প্রায় প্রথম অর্ধ-শতাব্দী, অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং পরাধীনতায় বিক্ষুব্ধ শ্রেণীর জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসর সময়টা ছিল পর্যায়ক্রমে পরিস্থিতি-পর্যবেক্ষণ, আত্মশোধন, জাগরণ, প্রতিরোধ সংগঠন, হতোদ্যম নিরসন এবং কৌশলগত অবস্থান গ্রহণের যুগ।[৩] স্বভাবতই কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই সুধীজন-সুলভ উন্নতমানের সাহিত্য সৃষ্টির মননশীল চিন্তা-চেতনা ও অনুশীলনের জন্য উল্লিখিত সময়টা মোটেই উপযোগী ছিলনা। অত এব,

সঙ্গত কারণেই আলোচ্য একশত বৎসর, অর্থাৎ ১৮৬০ খৃস্টাব্দে ভারত-চন্দ্রের মৃত্যুর সময় থেকে ১৮০০ খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত, এবং ১৮০১ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত দু'টি নির্দিস্ট সীমারেখায় ভাগ করা যায়। প্রথম অর্ধ শতক ছিল ক্রান্তিকাল ও অবক্ষয়ের যুগ এবং দ্বিতীয় অর্ধশতাধিক কাল ছিল বিবর্তন-অনুবর্তনের যুগ।

কিন্তু বাংলা কবিতার অবক্ষয় ও ক্রান্তি পর্ব ক্রমাগত একশত বৎসর, অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিস্ঠিত নতুন ঔপনিবেশিক সহর কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ১৮০০ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ষাট বৎসর খৃস্টান ধর্ম ও জীবন-দর্শন প্রভাবিত ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে ও সংক্রমণে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে নবোদ্ভাবিত গদ্য-ভাষার চর্চা ও অনুশীলনে সমগ্র বাংলাদেশ এক নবযুগের দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত। কেবলমাত্র বাংলা কাব্যানুশীলনে তখনো পর্যন্ত কোন নতুন যুগের উপক্রম সূচিত হয়নি। বস্তুতঃ সুধীজন-সুলভ কাব্যানুশীলনে তখনো একটা চরম শূন্যতা বিরাজমান ছিল। তার কারণ, ১৮০০ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নবযুগের প্রথম ষাট বৎসর কোন নতুন মাত্রার শিল্প-সৌন্দর্য চিন্তা করার মত একটা অবস্থা স্থাপিত হলেও কবিতার মত একটি অতি সূক্ষ্ম মননশীল ও সৃজন-ধর্মী শিল্প-কর্মের জন্য সময়টা এত কৃত্রিম ও সংক্ষিপ্ত যে, কোন দৃষ্টিক্ষম নতুন কবি-প্রতিভার আবির্ভাব আশা করা, বাংলা কবিতার ক্রম-বিকাশের প্রাচীন ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের বিবেচনায় অস্বভাবিক ও অসঙ্গত মনে না হলেও, পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রবল উচ্ছ্বাস-উত্তেজনায় তা সম্ভব ছিলনা। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন রাজত্বের নতুন ঔপনিবেশিক সহর কোলকাতা-কেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের 'এদেশীয়গণে'র মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা অতি দ্রুত আয়ত্ত-করণের উদ্যোগে এত বেশী তৎপরতা এবং ইউরোপীয় ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় এদেশীয় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন মত ও পথের শতোগ্র বিচার-বিতর্কে

ও নবোদ্ভাবিত গদ্য ভাষা চর্চার উৎসাহ-উদ্দীপনায় এত বেশী ব্যাপৃতা ও ব্যস্ততা ছিল[৪] যে,— কবিতা যে একটি অতি উচ্চ-মানের শিল্প এবং বাংলা কবিতার যে একটা অতি উন্নত প্রাচীন শৈল্পিক ঐতিহ্য আছে; সাধনায়, অনুশীলনে ও লালনে তার যে একটা অতি গৌরবিত ও মহিমান্বিত উৎকর্ষক সম্ভাবনা আছে,—সে বিষয়ে 'এদেশীয়' মনীষীদের চিন্তা করার মত কোন চেতনা কিম্বা সময় ছিল বলে মনে হয়না। এ জন্য বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীকে দীর্ঘ একশত বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবু এ সময়ের সুযোগ-কুযোগের উর্ধ্বচারী ব্যস্ত-ব্যাকুলতা এবং বিপর্যয়ের ঘনান্ধকারতার মধ্যেও বাংলার কবি-কণ্ঠ একেবারে নিরুদ্ধ ছিলনা। মধ্যযুগীয় কাব্যাদর্শের একটা ক্ষীণ ও অগভীর ধারার অপকৃষ্ট চর্চা ও তার আস্বাদন গ্রাম বাংলার এক শ্রেণীর অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত কবি ও ভক্তদের মধ্যে অব্যাহত ছিল। দিবাকরের বিদায়ে সন্ধ্যা-প্রদীপের অস্বচ্ছ আলোর মত, বাংলা কবিতার প্রাচীন মৌলিক অনুক্রমটিকে এ ক্রান্তিলগ্নে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল অশিক্ষিত, অপটু অতিসাধারণ এক শ্রেণীর গ্রামীণ স্বভাব-কবি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এরা অখ্যাত শ্রেণীর শায়ের ও কবিওয়ালা বলে পরিচিত।

দুই

শায়ের আরবী শব্দ, অর্থ কবি। কিন্তু উল্লিখিত সময়ের মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে শায়ের বলে খ্যাত, কবি কিম্বা সমকালের অপর শ্রেণীর সাহিত্য সাধকদের মত কবিয়াল বা কবিওয়ালা বলে খ্যাত নন। তার প্রথম কারণ, সম্ভবত, শায়েররা সকলেই অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মুসলমান এবং তাদের কবিতা বা কাব্যের সমজদার বা শ্রোতাও ছিলেন অশিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, শায়েররা বাংলার সঙ্গে পর্যাপ্ত আরবী, ফার্সী, হিন্দী, উর্দু শব্দের মিশাল দিয়ে তাদের কাব্য ও কবিতা রচনা করেছেন। আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশের বিশেষ করে পশ্চিম-বঙ্গের মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনের কথ্য ভাষায় বাংলার সঙ্গে আরবী, ফার্সী, হিন্দী, উর্দু শব্দের প্রয়োগ-রীতি ছিল ব্যাপক। সঙ্গত কারণেই, শায়েরদেরকে তাদের সমজদার বা শ্রোতাদের কথা মনে রেখেই তাদের কাব্যের

ভাষা-রীতি নির্বাচন করতে হয়েছে। তা'ছাড়া, কাব্যানুশীলনে মিশ্রিত (?) ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শায়েররা ভারতচন্দ্রের 'যাবনী-মিশাল' ভাষার[৫] দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন, যদিও ভারতচন্দ্রের বাগ-বৈদগ্ধ্য বা শিল্প-চাতুর্য সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। শায়েরদের রচিত কাব্যও আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে 'পুঁথি'[৬] সাহিত্য কিম্বা ভাষার মিশ্রণগত কারণে 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্য'[৭] রূপে বিশেষভাবে খ্যাত। পুঁথির মূল শব্দ সংস্কৃতের 'পুস্তিকা',—অর্থ পুস্তক, হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক।[৮] এতদর্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত কাব্য ও কবিতাই হস্ত-লিখিত পুঁথি। মধ্যযুগের যে কোন কাব্যের উল্লেখে 'পুঁথি' প্রয়োগ-সিদ্ধ প্রচল-শব্দ এবং মধ্যযুগের কাব্য রচিয়তাদের অধিকাংশই তাদের রচিত কাব্যকে পুঁথি বলেই উল্লেখ করেছেন। অতএব, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমগ্র সাহিত্য-কর্ম পুঁথি-সাহিত্য রূপে আখ্যাত না হয়ে, সাহিত্যের ইতিহাসে কেবল শায়েরদের রচনাকেই পুঁথি-সাহিত্যরূপে স্বতন্ত্র-ভাবে চিহ্নিত করার যথার্থতা বোধগম্য নয়। স্মর্তব্য, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, যেমন মধু-মালতী, লাইলী-মজনু, গুলে-বকাউলী, হাতেমতাঈ ইত্যাদি ব্যতীত শায়েরদের অধিকাংশ রচনাই রসুলে করীম, বিভিন্ন নবী, খলিফা ও ইমামদের জীবন-কথা এবং ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য—ব্যঞ্জক কিম্বা ঘটনা-বহুল ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বা কল্পিত মুসলিম নায়কদের বীরত্ব-পূর্ণ বিজয়-সূচক অথবা হিন্দু দেব-দেবীর উপর মুসলিম পীর-ফকীরদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার-মূলক কাহিনী-কাব্য।[৯] এ ছাড়া, ইসলাম ধর্মের নিয়ম-নীতি, কোরান, হাদিস, ফেকাহ্ বা তত্ত্ব ব্যাখ্যা নিয়েও শায়েররা কবিতা রচনা করেছেন।[১০] পুঁথি রচয়িতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান, মিশ্র ভাষা-রীতি ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের অভাব ব্যতীত, পুঁথি সাহিত্যের ছন্দ-রীতি যদিও তা' মধ্যযুগের পয়ারেরই অনুগামী, শৈল্পিক দীনতা, কলা-কৌশলের অভাব এবং পাঠ ও পঠনের একটা বিশেষ একটানা গ্রাম্য পদ্ধতি ইত্যাদি বিবেচনায়, মনে হয়, শায়েরদের কাব্য-কাহিনী অবজ্ঞার্থে বিশেষ অনর্থ সূচক পুঁথি, 'বটতলার পুঁথি,' 'দোভাষী পুঁথি' ইত্যাদি নামে আখ্যাত হয়ে থাকবে। শায়েরদের সাহিত্য-কর্মকে আবার কেউ কেউ ইসলামী বা মুসলমানী কাব্য,[১১] মিশ্র ভাষা-রীতির কাব্য[১২] বলেও অভিহিত করেছেন। শায়েরদের মত আলোচ্য কালের অপর শ্রেণীর কবি-গান বা কবি-সঙ্গীত

রচয়িতাদের প্রতিও, কিছু-শিক্ষিত এবং অধিকাংশই অশিক্ষিত সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত অতি প্রিয় 'কবিওয়ালা' বা 'কবিয়াল' নামের যে আখ্যায় তারা খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিল, সাহিত্যের ইতিহাসে সে আখ্যায় পরিচিত হওয়াটা অবশ্যই অসঙ্গত নয়। কিন্তু তাদের কবি-কর্ম আলোচনা-কালে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান, ভাষা ও ছন্দ-রীতির অপটুতা এবং গ্রামীণ স্বভাব-সুলভ অশালীন রসিকতা উল্লেখ প্রসঙ্গে যখন সাধারণের বড় শখ করে দেয়া তা'দের আখ্যাটির প্রতিও একটা অবজ্ঞা-সূচক মানসিকতা প্রকট হয়ে উঠে, তখনই তা' খুব অসঙ্গত বলেই মনে হয়।

সাহিত্য বিশ্ব-প্রকৃতির মতই বিবর্তিত সময়ের অনুসঙ্গী, স্বতঃ স্ফূর্ত; নদীর মত গতিশীল এক মৌলিক সৃষ্টি। মানব-লোক ও বিশ্ব-লোক সম্পর্কে মানুষের পর্যাবৃত্তিক ও সাহজিক চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতির প্রাকৃতিক ও শিল্পিক বিকাশই সাহিত্য। স্বভাবতঃই দেশ-কাল-ভেদে সাহিত্য রূপান্তর-প্রবণ। নদী সর্বত্র সর্বকালে একই ভাবে প্রবাহিত হয়না, সমভাবে বিচলিত হয়না, একই প্রকার সৌন্দর্যে-মাধুর্যে স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হয়না,—গতি পরিক্রমায় স্থান-কাল-ভেদে নদীর প্রবাহ কোথাও প্রশস্ত, কোথাও অপ্রশস্ত; কোথাও গভীর, কোথাও অগভীর; কখনো তরঙ্গ-ভঙ্গে বিক্ষুব্ধ, প্লাবিত; কখনো আবার ধীর, শান্ত কলস্বনে সাবলীল। কেবল স্থান-কাল-ভেদে প্রবহমানতার স্বরূপ-লক্ষণে কোথাও স্বচ্ছ-তোয়া, কোথাও ক্ষীণ-প্রবহা, কোথাও খরস্রোতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে আখ্যাত। সাহিত্যও, নদীর মতই বিচিত্র বিভঙ্গে বৈচিত্র্যময়। অভিন্ন ভাষা-ভাষী কোন দেশের সাহিত্যও জাতি-ধর্ম-সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিন্নতা বা ভাষা–রীতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ দৃষ্টান্তে সাম্প্রদায়িক-ভাবে বা অবজ্ঞার্থে আখ্যাত না হয়ে নদীর অনুরূপ স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের চেতনায় দেশ–কালগত অন্তর্মানসের স্বরূপ-লক্ষণ অনুসারেই বিন্যস্ত হওয়া আবশ্যিক।

পৃথিবীতে সম্ভবত বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে দেশের বহুল কীর্তিত রেনেসাঁসীয় আধুনিকতার যুগেও সাহিত্যের বিশ্লেষণ-ধর্মী ইতিহাস রচনায় সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ ও সরল স্বভাব-ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সাহিত্যিকের জাতি, ধর্ম ও সামাজিক অবস্থানের

ভিত্তিতে কিম্বা বিমিশ্র ভাষা-রীতির বৈসাদৃশ্য ও ভিন্নতার উপরি-কাঠামোগত গৌণার্থে সাহিত্যের শ্রেণী-বিন্যাস করা হয়েছে। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের কবি-সাহিত্যিকেরা তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য-সাধনা করেছেন। কিন্তু তাদের সাহিত্য-কর্মকে হিন্দু সাহিত্য বা মুসলিম সাহিত্য,—এ-রূপ সাম্প্রদায়িক বাচ্যার্থে উল্লেখ করা হয়নি। বরঞ্চ উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য-সাধকেরাই পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবোজ্জ্বল মানবতার বিশাল ঐতিহ্যিক বনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু উনিশ-বিশ শতকের রেনেসাঁসীয় আধুনিক যুগে একই ভৌগোলিক সীমারেখার অভিন্ন ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্যের উক্তরূপ সাম্প্রদায়িক উপরিকাঠামোগত শ্রেণী-বিন্যাস খুবই দুর্ভাগ্যজনক। মানব-মুক্তির এ অতি আধুনিক প্রগতির যুগে এ-রূপ অমুক্ত সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সর্বার্থেই অকল্যাণকর এবং অনতিবিলম্বে পরিহার্য।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন বা মধ্যযুগের 'হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক' কিম্বা আধুনিক 'পুস্তক' অভিধার যে-কোন তাৎপর্যেই শায়েরদের সাহিত্য-কর্মকে 'পুঁথি'-রূপে অভিজ্ঞাত করা হোক, একমাত্র 'অনর্থে'[১৩] ব্যতীত অপর কোন অর্থেই তা' গ্রাহ্য নয়। তা'হলে মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বাংলা সাহিত্যই 'পুঁথি' সাহিত্য-রূপে পরিচিত হওয়া উচিত। অপরদিকে 'দোভাষী' কিম্বা 'মিশ্র ভাষা-রীতি'র কাব্য রূপে শায়েরদের সাহিত্য-কর্মের সংজ্ঞা কতটা গ্রহণযোগ্য, তা'ও বিতর্কের অতীত নয়।

শায়েরদের সাহিত্য-কর্মের 'দোভাষী' কিম্বা 'মিশ্র ভাষা-রীতি'র কাব্য রূপে উভয় সংজ্ঞাই কিঞ্চিৎ পার্থক্যে প্রায় সমার্থক। মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম জাতি-সমূহের আরবী, ফার্সী, তুর্কী—এ তিনটি প্রধান ভাষাই পর্যায়ক্রমে মুসলিম শাসনামলের মধ্যযুগে উপমহাদেশে প্রবেশ করে। কাল-পরিক্রমায় তিনটি ভাষাই মিশ্রিত রূপে 'সাবনী' বা 'মুসলমানী' ভাষার একক নামে পরিচিত হয়ে উপমহাদেশের ভাষা-সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং ফলক্রমে আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হিন্দী ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে 'উর্দু' ভাষা নামে একটি নতুন ভাষার উদ্ভব সূচিত হয়। বলাবাহুল্য, এ নবাগত 'মুসলমানী ভাষা'য় ফার্সী ভাষার

প্রাধান্যই সর্বাধিক। মধ্যযুগের শেষার্ধের দিকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এবং প্রশাসনিক-অর্থনৈতিক গুরুত্বের প্রয়োজনে, প্রাত্যহিক সমাজ-জীবনের লেন-দেনে এবং ভাবের আদান-প্রদানে দেশীয় ভাষা-সমূহে এই নতুন 'মুসলমানী ভাষা'র শব্দরাজির প্রবেশ ও প্রয়োগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনই এক পর্যায়ে বাংলা ভাষার সঙ্গে 'মুসলমানী ভাষা'র মিশ্রণে রচিত শায়েরদের কাব্যের 'দোভাষী' কিম্বা আরবী-ফার্সী-তুর্কী ইত্যাদি ভাষার স্বাতন্ত্র্য বিবেচনায় 'মিশ্র ভাষা-রীতির কাব্য' পরিচিতিতে মূলতঃ 'দোভাষী' অভিধার কোন পার্থক্য নেই। তবে শেষোক্ত আখ্যাটির সঙ্গে পুঁথির পরিবর্তে 'কাব্য' শব্দটির সংযোজন অবশ্যই তাৎপর্যবহ। তবে 'দোভাষী' কিম্বা 'মিশ্র ভাষা-রীতি' আখ্যার কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

কারণ, সংশ্লিষ্ট অপর কোন সভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতির ভাষা থেকে প্রয়োজনবোধে ভাব-প্রকাশে সহজ ক্ষমতা-সম্পন্ন, উপযোগী শব্দরাজি আত্মভূত করে স্বীয় ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারকে বহুমুখী বিকাশ-যোগ্যতায় সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা, যে-কোন প্রগতিশীল ভাষার স্বাভাবিক গুণ-ধর্ম। উদাহরণ-স্বরূপ ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ভাষার নাম করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার সে-গুণ ছিল প্রাচীন কাল থেকেই এবং এখনো আছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী-তুর্কী ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণের সেই স্বাভাবিক গুণ-ধর্মের প্রক্রিয়া চলছিল এবং গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা যখন একটা নতুন মাত্রায় উত্তরণের পর্যায়ে শীলন-রত ছিল, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যার মুখবন্ধ করেছেন 'যে হোক সে হোক ভাষা কাব্যরস লয়ে'[১৪] উল্লেখ করে, ঠিক সে-সময়েই উপমহাদেশের ইতিহাসে সুদূরগামী সেই মহা অঘটনাটি (রাজনৈতিক বিপর্যয় ও স্বাধীনতার বিনাশন) সংঘটিত হলো। নতুবা আরবী-ফারসী-সংস্কৃত ও দেশী ভাষার সমন্বয়ে বাংলা ভাষা আজ একটি অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন ভাষায় পরিগণিত হত। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে, বাংলাদেশের উল্লিখিত-রূপ দুঃসময়ের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং ভাষা ও সাহিত্যের এক মহা-ক্রান্তি-পর্বে শায়ের ও কবিওয়ালারা কাব্য-চর্চা করেছেন। বাংলার সঙ্গে আরবী-ফার্সী-তুর্কী শব্দ-মিশ্রিত

বোল-চালের ভাষাই ছিল তখন আপামর সাধারণের স্বীকৃত ভাষা তথা বাংলা ভাষা। নতুবা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা-কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর সে-ভাষায় কবিতা রচনার প্রয়াস গ্রহণ করতেন না। শায়েররাও সেই কালিক বাংলা ভাষায়ই তা'দের কাব্য রচনা করেছেন। সঙ্গত কারণেই শায়েরদের সাহিত্য-কর্মকে 'দোভাষী' কিম্বা 'মিশ্র ভাষা-রীতি'র কাব্য-রূপ পরিচিতি সমীচীন নয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে ইংরেজী রাজকার্যের ভাষা-রূপে প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ফার্সী ভাষা সরকারী ভাষা-রূপে প্রচলিত ছিল। সন্দেহের অবকাশ নেই, তখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কথিত ভাষায় ফার্সী শব্দের প্রবেশ ও ব্যবহার প্রায় অবাধ ছিল। পরন্তু একটা বোধ-গম্য ও সম্মত বোলচালের বাংলা-ভাষায় রচিত বলেই সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে শায়ের-রচিত কাব্য অতি দ্রুত এত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, এর ক্রমবর্ধমান সমাদরে এবং উল্লেখ-যোগ্য সংখ্যক শায়েরের আবির্ভাবে সমগ্র উনিশ শতক-ব্যাপী তার অনু-শীলন অব্যাহত ছিল; এবং দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত অতি উৎসাহ-উদ্দীপনায় গ্রামে-গঞ্জে গীত-বাদ্যের সঙ্গে মহা-সমারোহে পঠিত ও শ্রুত হত। উল্লেখ্য, শায়েররা সকলেই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, হিন্দু শায়েরও ছিলেন। আঠারো শতকের শেষ দিকের রচনা বলে অনুমিত রাধাচরণ গোপ নামে একজন হিন্দু শায়েরের 'ইমামবনের কেচ্ছা' বা 'ইমামের জঙ্গ' নামক একটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।[১৫] তদ্রূপ কবি-ওয়ালাদের মধ্যেও মুসলমান কবি-ওয়ালার পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬] এ-সময়ে আরবী-ফার্সী-তুর্কী শব্দ প্রবিষ্ট বাংলা ভাষা কেবল স্বীকৃতিই লাভ করেনি, আদরণীয়ও হয়ে উঠেছিল, সুতরাং এ-ভাষাই ছিল আলোচ্য যুগের কিম্বা মধ্যযুগের বাংলা ভাষা। ভাষার পরিবর্তন-প্রবণ স্বভাব এবং রূপান্তর-ধর্মিতার প্রেক্ষিতে এ সময়ে কিংবা মধ্যযুগে রচিত মুসলিম কবি-সাহিত্যিক বা শায়েরেদের সাহিত্য-কর্মকে 'ইসলামী',[১৭] 'দোভাষী' 'মিশ্র ভাষা-রীতি'র কাব্যরূপে উল্লেখ কেবল অসমীচীনই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বা অধ্যায়কে সাম্প্রদায়িক অবজ্ঞার্থে বা সূচীবদ্ধ করা রক্ষণশীল ও কুণ্ঠ-মনস্কতারই পরিচায়ক মাত্র।

আলোচ্য যুগে অর্থাৎ পরিবর্তিত ঔপনিবেশিক রাজনীতির সুযোগে ও সহায়তায় সুপরিকল্পিত উপায়ে সংস্কৃত ভাষা থেকে পর্যাপ্ত অপ্রচলিত

শব্দের যোগান দিয়ে ইতোমধ্যে আত্মভূত ও স্বীকৃত আরবী-ফার্সী-তুর্কী শব্দ বর্জন করে বাংলা ভাষাকে একটা বিশুদ্ধ, সজ্জনের অভিজাত রূপ দেবার সযত্ন প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও ভাষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক সৌকর্য ও লালিত্যের প্রয়োজনে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রভূত আরবী-ফার্সী-তুর্কী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং অদ্যাবধি তার প্রয়োগ রীতি-বিধি ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উল্লিখিত শব্দ-সমূহের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান আজ অবধি অনিরূপিত। অপরদিকে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের নাগরিক-গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিক লেনদেনের ভাষার প্রায় আধা-আধি শব্দই আরবী-ফার্সী-তুর্কী,—সে-বিষয়ে আমাদের ভাষা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিমাত্রই সম্যক অবগত আছেন। কিন্তু সে-সাহিত্য, সে-ভাষা বাংলা ভাষা-রূপেই পরিচিত,—'ইসলামী', 'দোভাষী' কিম্বা 'মিশ্র ভাষা'-রূপে পরিচিত নয়। আসলে সবদেশের ভাষাই বিবর্তিত সময়ের অনুষঙ্গী, পরিবর্তনশীল এবং অপর ভাষা ও সংস্কৃতির সংস্রবে রূপান্তর-প্রবণ। কিন্তু তাই বলে কোন বিশেষ ভাষা কিম্বা সাহিত্যিক ভাষার মৌলিক জাতীয় নাম-পরিচিতি পরিবর্তিত হয়না। আধুনিক সাহিত্যের ভাষা যেমন বাংলা, তেমন চর্যা-পদের, মধ্যযুগের কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষাও বাংলা ভাষা-রূপেই খ্যাত। ভাষাও সাহিত্যের উল্লিখিত ব্যাখ্যানের আলোকে কবি-ওয়ালা ও শায়েরদের সাহিত্য-কর্ম,—সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাথমিক পরিচিতি-রূপে 'ক্রান্তি-পর্বের বাংলা কাব্য' অভিধাই যথার্থ সাহিত্য-সম্মত সূচী। তবে একটা আপৎকালীন ক্রান্তি-পর্বের সাহিত্যের বিবর্তিত-বৈলক্ষণ্য অনুযায়ী শায়ের ও কবিওয়ালাদের সাহিত্য-কর্মের অন্তর্মানস ও স্বভাব-ধর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যানুগ শ্রেণী-বিন্যাস ও বিচার-বিশ্লেষণ অবশ্যই স্বীকার্য। সেই অনুমতে সাহিত্যের ইতিহাসে শায়েরদের সাহিত্য-কর্ম 'ধর্মীয় আদর্শ ও মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য-কথা এবং বীরত্বব্যঞ্জক ও বিজয়-সূচক রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য' কবিওয়ালাদের সাহিত্য-কর্ম 'ভক্তিমূলক গান ও প্রণয়-সংগীত'[১৮]-রূপে শ্রেণী বিভাজন সাহিত্য-সঙ্গত ঔচিত্যে গ্রাহ্য। তদ্রূপ সাহিত্যের অন্তর্মানসগত বিশিষ্টার্থে অসাম্প্রদায়িক ও মোহমুক্ত অভিজ্ঞার আলোকে পাল-যুগে রচিত বৌদ্ধ-গান ও দোহার যে কটি পদ উন্মেষ-কালের বাংলা ভাষায় রচিত বলে প্রমাণিত, সে-গুলো 'অধ্যাত্ম মরমী সঙ্গীত'[১৯]; মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্য-রূপে আখ্যাত সাহিত্য-কর্ম 'দেব-মাহাত্ম্যের কাব্য' বৈষ্ণব-সাহিত্য

ও লালন-গীতিকা 'রূপকাশ্রয়ী আধ্যাত্মিক প্রেম-সঙ্গীত' এবং মানব-প্রণয় সম্পর্কিত কাহিনী-কাব্যের 'রোমান্টিক প্রণয়োপ্যাখান' রূপ ইত্যাদি অভিধার একক ও অভিন্ন পরিচয়ে আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে সূচীবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

তিন

কোন অখণ্ড ভৌগোলিক সীমারেখার অভিন্ন ভাষাভাষীর যুগ-চেতনা অনুসারী সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কর্মকে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়গত ভাবে বিশ্লিষ্ট না করে, সাহিত্যকে শুধু সাহিত্যের অনন্যতায় তার মৌলিক আবেগ ও স্বরূপত্বের বৈশিষ্ট্য অনুসারে উল্লিখিত-রূপ অভিধা, সাহিত্যের বিবর্তিত ক্রম-বিকাশ ও ক্রমোৎকর্ষের একটা বস্তুনিষ্ঠ, নির্মোহ ও বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার নিরূপণের সহায়কই কেবল নয়, সাহিত্যের স্বভাব-সঙ্গত ঔচিত্য চেতনায়ও অনস্বীকার্য। জন্মলগ্ন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে বাংলা কবিতারও বিবর্তন, ক্রম-বিকাশ, উৎকর্ষ ও পরিণতির ঐতিহাসিক মৌলিকত্ব ও উত্তরাধিকারের স্বরূপ অনুসরণ ও মূল্যনিরূপণেও উল্লিখিত অভিজ্ঞানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও অবশ্যই স্বীকার্য। বৃটিশ শাসনামলের তথাকথিত রেনেসাঁসীয় দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণ-শীল বিচার-বিবেচনায় আলোচ্য ক্রান্তি-পর্বের শায়ের ও কবিওয়ালাদের সাহিত্য-কর্ম, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে অভিধায়ই আখ্যাত হোক এবং তাদের সাহিত্যানুশীল যত উদাসীনতার সঙ্গেই উল্লেখ করা হোক,—একটা সর্বাত্মক বিপর্যস্ত যুগে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের বিবর্তনগত পর্যাবৃত্তি, এবং সংশয়িত, বিমূঢ় লোকমানসতার দিক থেকেও, এ-সময়ে রচিত কাব্য-কবিতার নাক উঁচানো, বিযুক্ত বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অধ্যায়ের ইতিহাস ও সাহিত্যের সাহজিক মানবীয় গুণ-ধর্ম তথা মূল্যবোধকেই কেবল অগ্রাহ্য করা হয়না, আমাদের কুণ্ঠিত, অযুক্ত মানসিকতার পরিচয়ও বহন করে।

১৭৫৭ খৃস্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতার অবলুপ্তি এবং মাত্র তিন বৎসরের ব্যবধানে মধ্যযুগের সর্বশেষ যুগান্তকারী ও মোহমুক্ত মানবতাবাদী কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক

মূল্যবোধই কেবল নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির মহান গৌরব-দীপ্ত মানব-সত্যও অবসিত হয়। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিকারের স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘট অবস্থার বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই মধ্যযুগের সমস্ত গৌরব-ঐতিহ্য, বাদশাহী-সুলতানী-নবাবী আড়ম্বর, জ্ঞানী-গুণীর শাহী সমাবেশ-সমারোহ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির দরবারী আভিজাত্য, গৌরব-চর্চা-সমাদর ; সামাজিক রীতি-নীতি, বিধি-বিধান, মান-মর্যাদা যেন ভোজ-বাজীর মতোই কোথায় সব উবে গেল। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের এমন একটা আচম্বিত ও অবিশ্বাস্য আমূল পরিবর্তনে সমগ্র দেশবাসী হতভম্বপ্রায়, বিশেষ করে দেশের উচ্চতর শ্রেণী একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় দ্বিধাবিভক্ত এবং বিচার-বোধ-রহিত। এরূপ দ্বিধা-সঙ্কুল ও পরিবর্তিত বিরুদ্ধাবস্থা কোনরূপ সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল নয়। তবু সাহিত্য নদীর মতো অন্তঃসলিলা, অবাধ—দেশ-কাল-অবস্থা ভেদে বাঁক-নিপুণ, রূপান্তর-প্রবণ, কিন্তু রুদ্ধগতি নয়। বাংলাদেশের ক্রান্তি-পর্বের উক্ত-রূপ মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় দ্বিধাগ্রস্ত ও বিমূঢ় পরিস্থিতিতে বাংলা কবিতার বাঁক ও রূপান্তর গ্রহণের সন্ধিমুখে উল্লিখিত রূপ শায়ের ও কবিওয়ালাদের আবির্ভাব রাজনৈতিক ও আর্থ-সমাজ-সংস্কৃতির আপেক্ষিক কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বিচারে তো অবশ্যই, বাংলা সাহিত্যের পূর্বাপর পারম্পর্যের স্বরূপ-লক্ষণের দিক থেকেও কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়। সবিশেষ লক্ষণীয়, শায়ের ও কবিওয়ালাদের, বিশেষ করে কবিওয়ালাদের যুগ, অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত[২০] সুদীর্ঘ একশত বৎসরের মধ্যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, দেশ, মানুষ, জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের মতো মোহ-মুক্ত, মানবীয় চেতনার উদ্দীপক কিম্বা অনুসারী কোন সজ্ঞান, মহৎ কবির আবির্ভাব ঘটেনি।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, কয়েকটি বিশুদ্ধ, অতি-রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ব্যতীত শায়েরদের সাহিত্যানুশীলনের বিষয় মূলতঃ ও প্রধানতঃ ইসলাম ধর্ম,—ইসলাম ধর্মের আদর্শ, মাহাত্ম্য ও তত্ত্বব্যাখ্যা; মহাপুরুষদের জীবন-কথা এবং অপর ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ইতিহাস-খ্যাত ও কল্পিত নায়কদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক বিজয়ের রোমান্টিক কাহিনী। শায়েরদের এ-জাতীয় রচনায় একটা সাম্প্রদায়িক মানসিকতার লক্ষণ অবশ্যই স্বীকার্য। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, মুসলিম শাসনামলের

সুদীর্ঘ মধ্যযুগে, দু'একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া একমাত্র মুসলমান কবি-সাহিত্যিক ভিন্ন অপর সকল কবি-সাহিত্যিকই তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়গত ধর্ম, দেবতার প্রশস্তিমূলক কাব্য-কবিতা রচনা করেছেন। একমাত্র মুসলমান কবি-সাহিত্যিকেরাই এ সময়ে বাংলা কবিতাকে তার একাধিকারী সাম্প্রদায়িক গণ্ডী থেকে মুক্তকরে মানব-সম্পর্কের এক সুদূর-প্রসারী মহত্তম তাৎপর্যে সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করে তোলেন। উক্ত সময়ে বহু মুসলমান কবি-সাহিত্যিক বিবিধ বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাদের কাব্য-চর্চায় কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব তো ছিলইনা, বরঞ্চ সাহিত্যের স্বাভাবিক নান্দনিক প্রেরণায় তাঁরা বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন, বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখেছেন, মহাভারত অনুবাদ করেছেন, ভাবাত্মক আধ্যাত্মিক সংগীতের সাধনা করেছেন, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা ও অনুবাদ করেছেন।[২১] কিন্তু তাঁদের সাহিত্যানুশীলনের বিষয় বা চরিত্র নির্বাচনে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের ভেদাভেদটা কোন বিবেচ্য বিষয়ই ছিলনা, কাব্য-কবিতার ভাব বা বিষয়ের আনন্দদায়ক মানবিক সৌন্দর্য-অনুভবটাই ছিল প্রধানতম অভীপ্সা। তাই তাঁরা সম্পূর্ণ অকুন্ঠিত চিত্তে হিন্দু নায়ক-নায়িকা অবলম্বনে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান লিখেছেন, বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। এমন কি সৈয়দ সুলতানের নবী বংশ (১৬৫৪),[২২] জঙ্গনামা কাব্যেও এতদ্দেশীয় অপর ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রকার প্রোৎসাহন বিদ্বেষের ভাব নেই। প্রসঙ্গত সৈয়দ আলাওলের ধর্ম সম্পর্কিত কাব্যগুলোর কথাও বলা যেতে পারে। আসলে, বিশুদ্ধ মানবিক আর্দশের সৌন্দর্যই ছিল মধ্যযুগের মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনার মৌলিক প্রেরণা। অথচ, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পনীর বাংলাদেশ অধিকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান শায়েরদের সাহিত্য-কর্মে প্রথমবারের মত একটা সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রকাশ কৌতূহলোদ্দীপক ভাবেই লক্ষ্যযোগ্য। অবশ্যই তার একটা অতি বেদনাদায়ক ও অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক কারণও খুব দুর্জ্ঞেয় নয়। এ মহাদেশেরই ইতিহাসের সুদূর অতীতে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের ফলে যে সব কার্য-কারণ-সম্বন্ধের প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক দেব-কাহিনীর পুরাণগুলো লিখিত হয়েছিল এবং বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনে মধ্যযুগের প্রথমার্দ্ধে আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ও ধর্মীয় বৈসাদৃশ্য-বৈপরীত্বের ভাবাবেগের কারণে সাম্প্রদায়িক

মঙ্গলকাব্যগুলো রচিত হয়েছিল, অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধে বাংলাদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যের শুরুতেই অনুরূপ আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ও ধর্মীয় বৈরিতার অধিকতর প্রবল ও ব্যাপক কারণে বিপর্যস্ত ও স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে শঙ্কিত বাঙালী মুসলিম শায়েরদের সাহিত্য সাধনায় জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা অনিবার্যভাবেই প্রধান বিষয় হয়ে উঠে। শায়েররা শিক্ষা-দীক্ষায় এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের বিচারে নিম্ন-স্তরেব হ'তে পারে এবং স্বীয় ধর্মের অভিজাত বিজিত শাসক-শ্রেণী কর্তৃক অবহেলিত হ'তে পারে, কিন্তু জাতি-ধর্ম-স্বদেশ সম্পর্কে অসচেতন ছিলনা।

মধ্যযুগে বহিরাগত সম্ভ্রান্ত, অভিজাত মুসলিম শাসক-শ্রেণী কর্তৃক অবহেলিত উপেক্ষিত এদেশের ধর্মান্তরিত দরিদ্র বাঙালী মুসলমানেরা, এদেশেরই উচ্চ-বর্ণ শ্রেণী কর্তৃক অবজ্ঞাত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে শাসক-গোষ্ঠীর নিপীড়ন-উৎপীড়ন-শাসন-শোষণের সমভোগীদের সহ-মর্মিতায় অসাম্প্রদায়িক প্রতিবেশী রূপে সুখে-দুঃখে একত্রে বাস করে এসেছে বহুকাল। শাসক-গোষ্ঠী স্বীয় ধর্মাবলম্বী হলেও সহাবস্থানকারী হিন্দুদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেনি কখনো। কারণ দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছিল, ধর্ম তাদের যাই হোক, আর্থিক, সামাজিক ও পেশার দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর অভিজাত ও উচ্চ-সমাজের নিকট অবজ্ঞাত মানুষ ব্যতীত তা'দের অপর কোন পরিচয় নেই। তাই সাধারণ অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কৃষক-মজুর-তন্তুবায় শ্রেণী সংখ্যাগুরু বাঙালীর কাছে, বিশেষ করে ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমানের কাছে ধর্মের পার্থক্যের চেয়ে অভিন্ন-ভাষী বাঙালিত্বের পরিচয়টাই ছিল প্রধান। অপর দিকে, শান্তিপ্রিয় সহাবস্থানকারী-রূপে বাস করলেও দেশের শাসনভার মুসলমানের হাতে ন্যস্ত থাকায়, বাঙালী মুসলমানের প্রতি প্রতিবেশী হিন্দুদের মনোভাব, বলা যেতে পারে, অনেকটাই ছিল প্রচ্ছন্ন।

কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে একটা ন্যক্কারজনক পন্থায় ইসলাম ধর্ম-বিদ্বেষী সুদূরাগত বহির্শক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের আধিপত্য গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত বিদেশী শাসকের প্রতি বিশেষভাবে অনুগৃহীত ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত অপর ধর্ম-শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন এবং অপরদিকে

যুগপৎ সর্বশ্রেণীর মুসলমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পূর্বাবস্থা থেকে ক্রমানুয়ে সর্বস্বান্ত করনের প্রক্রিয়ার প্রতি এতকালের সহাবস্থানকারী, অভিন্ন-ভাষী নিকটতম প্রতিবেশী হিন্দুদের প্রসন্ন ও প্রশান্ত ঔদাসীন্য-দৃষ্টে স্বদেশ ও অস্তিত্বসচেতন সাধারণ বাঙালী মুসলমানের মনে একটা হতাশা ও বেদনাদায়ক উৎক্রমী বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াটা, মানবাধিকারের বিচারে, মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ইহা এতদ্ব্যতীত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক রচিত অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহ্‌কে দিয়ে দেবী অন্নদার পূজা করানোর ঘটনাটাও[২৩] সঙ্গত কারণে ইতি-পূর্বেই সাধারণ বাঙালী মুসলমানের প্রাণে ক্ষোভ সৃষ্টি করে থাকবে। অতএব, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান শায়েরদের কাব্য-কাহিনীতে একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সংক্রমণ বা সঞ্চারণ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তবু তাদের কাব্য-কবিতায় মানব-সত্যর কোন অসদ্ভাব ছিল না।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সমগ্র উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কলির-সন্ধ্যা স্বরূপ এদেশের শাসন-কর্তারূপে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুপ্রবেশ অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মুসলমান যত দ্রুত ও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, কৌতূহলের সঙ্গেই ধারণা হয়, বিজিত অভিজাত মুসলিম শাসকশ্রেণী তা' অনুধাবন করতে পারেনি, কিম্বা আধিপত্য হারিয়ে অনুধাবন করার মত সাহসিক মানসিকতা বা দূর-দৃষ্টি তাদের ছিলনা। বাংলাদেশে ইংরেজাধিকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শায়েরদের ইসলাম ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও মহা-পুরুষদের জীবন সম্পর্কিত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক কাব্য-কথা এবং বীরত্ব-ব্যঞ্জক রোমান্টিক কল্প-কাহিনী রচনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। শায়েরদের কাব্য-কবিতা, ভাষা, ছন্দ-প্রকরণ ও অবয়ব-সংগঠন যত নিম্ন-মানেরই হোক, একটা সমূহ আপৎ-কালে স্বধর্ম ও স্বজাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে বাঙালী মুসলমানদেরকে সাহসিক উদ্দীপনায় সচেতন ও সংগঠিত করে তোলাই ছিল এসব কাব্য-কাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শতাব্দীকাল-ব্যাপী শায়েরদের উল্লিখিত কাব্য-কাহিনী রচনার পাশাপাশি ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের অবরোধ-প্রতিরোধ-সংঘাতের ঘটনা এবং তাদের

নেতৃত্বে কোন বিজিত মুসলমান রাজ-পুরুষের অবিদ্যমানতা, উক্ত সময়ের বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন।

বিশেষভাবে স্মর্তব্য, অনেককাল পরে উনিশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষার সর্বক্ষেত্রে একতরফাভাবে হিন্দুদের অগ্রসরমানতার তুলনায় মুসলমানদের অবস্থা ও অস্তিত্বের করুণ ও হতাশা-ব্যঞ্জক দুরবস্থা ও দুর্দশা দৃষ্টে নবীন শিক্ষিত মুসলমান সাহিত্য-সাধকরাও ইসলাম ধর্মের মহিমা-ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়েই সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন,[২৪]— উদ্দেশ্য ধর্ম ও জাতীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন, নিগৃহীত, বঞ্চিত ও অধঃকৃত মুসলমানদের চৈতন্যোদয়। তবে আধুনিক শিক্ষায় আলোক-প্রাপ্ত ছিলেন বলে, দু'একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম ব্যতীত, উনিশ শতকের নবীন এবং বিশ শতকের প্রবীণ মুসলিম সাহিত্যিকেরা যদিও ইসলাম ধর্ম ও তার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়েই সাহিত্য-সাধনা করেছেন, মন-মানসিকতার দিক থেকে স্বভাবতই অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত শায়েরদের তুলনায় তাদের অধিকাংশই ছিলেন বাস্তব-ধর্মী, অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্ত মানবতাবাদী। অপর ধর্মের প্রতি মৃদু কটাক্ষ থেকেও তারা ছিলেন বিরত। কিন্তু আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিক ও অশিক্ষিত শায়েরদের মধ্যে ভাষা ও দৃষ্টি-ভঙ্গির মানগত পার্থক্য ব্যতীত সাহিত্য-চর্চার মূল প্রেরণার দিক থেকে বিশেষ কোন ভিন্নতা ছিলনা। তবে এ তথ্য অবশ্যই স্বীকার্য যে, অধিকাংশ মুসলিম কবি-সাহিত্যিকই তাদের সাহিত্যানুশীলনের বিষয় নির্বাচনে কম-বেশী শায়েরদের কাছে ঋণী কিম্বা তাদের কাব্য-কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত ছিলেন। অতএব, আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে শায়েরদের কাব্য-কাহিনী যতই অপকৃষ্ট রচনার 'পুঁথি-সাহিত্য' রূপ অনর্থে উল্লেখ্য ও অল্পালোচিত হোক, ইংরেজ শাসনামলের শুরুতে নিগৃহীত, বঞ্চিত ও অবহেলিত মুসলমানদের জাতি, ধর্ম ও অস্তিত্ব সম্পর্কে চৈতন্যোদয়ের ঐতিহাসিক বিচারে প্রাথমিক সচেতন পথিকৃৎ-রূপে শায়েরদের অবদান অতি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ্যই নয় কেবল, সমকালের আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ও ধর্মীয় কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিরিখে অভিনিবেশের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে উপস্থাপন করা আবশ্যক।

চার

শায়েরদের সমকালে অর্থাৎ বাংলা কবিতার ক্রান্তি-যুগে অপর এক শ্রেণীর সহজ রসের এবং অনায়াস বাঁধুনির সাহিত্য-কর্ম হলো কবি-গান বা কবি-সংগীত। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক কাঁচা পয়সার প্রশাসনিক সহর কোলকাতার নগর-জীবনে যত প্রকার সস্তা ও স্থূল রস-রুচির আনন্দ-উল্লাস ও বিলাস-ব্যসনের উপকরণ-উপযোগ ছিল, তার মধ্যে একমাত্র কবি-গান বা কবি-সংগীত ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির সাহিত্য-রসাশ্রিত এবং সর্বজনাদৃত আনন্দ সামগ্রী। কবি-গানের রচয়িতারা শায়েরদের মতই একশ্রেণীর অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত স্বভাব-পটু কবি। তবে রুচি ও মন-মানসিকতার দিক থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তারা সখের কবি-ওয়ালা-রূপে খুবই আদরণীয় ছিল। ভবানীর পিতৃগৃহে আগমন উপলক্ষে কারুণ্য-মিশ্রিত ভক্তিমূলক-স্তুতি এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কিত রাগ-বিরাগ, মান-অভিমান, বিরহ-যাতনা ইত্যাদি ছিল কবি-গানের অবলম্বিত বিষয়। বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রসহ গীতাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি সহজেই উল্লসিত করে তোলার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বিষয় অবলম্বনে তাৎ-ক্ষণিক ভাবে কিম্বা পূর্বাহ্নে রচিত এবং বক্তব্যের বিষয়, ভাব-ভঙ্গির, উপস্থাপনার রীতি-প্রকৃতি ইত্যাদির লক্ষণ-বৈসাদৃশ্য বিবেচনায় পাঁচালী, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, টপ্পা, খেউড়, তর্জা ইত্যাদি স্বতন্ত্র সংজ্ঞায় পরিচিত বিভিন্ন গানকে একত্রে কবি-গান বা কবি-সংগীতের একক নামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্মর্তব্য যে, সমকালে কবি-গান বা কবি-সংগীত 'কবির লড়াই'[২৫] পরিচয়ে সর্বাধিক লোক-প্রিয় হয়ে উঠে ছিল। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য, কবিগানের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গানই প্রতিযোগিতা-মূলক ছিল। অর্থাৎ কবি-গানের আসরে দুটো দল থাকবে, একটি দল উল্লিখিত কোন বিষয়ে গানের সূচনা করবে (চাপান), সূচনা শেষ হলে প্রতিদ্বন্দ্বী দল তার প্রতি-উত্তর দেবে (উতোর)। এমনিভাবে গানে গানে উত্তর-প্রতি-উত্তরের মাধ্যমে গান জমে উঠবে যখন, তখন এক পর্যায়ে এসে একটা সন্তোষ জনক পরিসমাপ্তি ঘটত এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর বিচারে শ্রেষ্ঠ গায়ক দলকে বিজয়ী দল বলে ঘোষণা করা হতো। কিন্তু কোন কোন কবি-দলের গান উতোর-চাপানের উষ্ণতায় প্রথম বাদ-প্রতিবাদে এবং শেষে ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের কটূক্তিতে পর্যবসিত হতো।

এ জাতীয় গানগুলোই 'কবির-লড়াই' পরিচিতিতে বিশেষভাবে লোক-প্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা সম্পর্কিত এ জাতীয় 'কবির লড়াই' নামের গানই ছিল কবি-গানের সবচেয়ে জনপ্রিয় অধ্যায়। এ 'কবির লড়াই'কে সামনে রেখেই প্রতিযোগিতামূলক গান মাত্রই সজ্জনের ভাষায় কবি-গান আখ্যায় পরিচিতি লাভ করে। বস্তুতঃ 'কবির-লড়াই' নামক গানই যথার্থ কবি-গান। নতুবা কিছু কিছু গানকে 'দাঁড়া কবি-গান', 'বসা কবি-গানে'র স্বতন্ত্র সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা হতোনা, এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত বিভিন্ন সংজ্ঞায় স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত কবি-গানের প্রতিটি শাখার সঙ্গে 'কবি-গান' শব্দটির উল্লেখ করা হতো। এতেও ধারণা হয় কবি-গানের অন্তর্ভুক্ত সব গানই 'কবি-গান' ছিলনা। 'কবির লড়াই' তথা 'কবি-গান' নামক সখি-সংবাদ বিষয়ক কোন কোন গানে কোন কোন কবিওয়ালার দল লঘু করুণ রসের সঙ্গে উতোর-চাপানের কৌশলী চমকের উষ্ণতায় কটূক্তির মিশাল দিয়ে শ্রুতি-সুখদ ও চিত্ত-বিনোদী চরণ সৃষ্টি করে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উল্লসিত করে বাহ্‌বা কুড়িয়ে এক প্রকার আনন্দ অনুভব করতেন। আসলে সখি-সংবাদ বিষয়ক এ শ্রেণীর গানগুলোকেই কেবল 'কবি-গান' সংজ্ঞার স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। উক্ত অর্থে কবি-ওয়ালাদের সব গানই কবি-গান নয়। যেমন, ভবানী বিষয়ক ভক্তি-মূলক করুণ রসের গান কিম্বা রাধার বিরহ-যাতনা ভিত্তিক কোন কোন কবি-ওয়ালার ব্যক্তিক অনুভূতির করুণ রসাশ্রিত প্রেম সংগীত-গুলো প্রতিযোগিতামূলক চাপান-উতোর পর্যায়ের হলেও কবি-গান বা কবির লড়াই বলতে যে ধারণা পাঠকের মানসলোকে জেগে উঠে কবি-ওয়ালাদের অনেক সংগীতই সে ধারণার পর্যায়ভুক্ত করা যায়না। এতদভিন্ন বাংলা কবিতা জন্ম-লগ্নেই সংগীতময়। প্রণয়োপাখ্যান ও অনুবাদ সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত কবি-কৃতিই গান বা গীতরূপে আখ্যাত হয়ে এসেছে। যেমন, চর্যা-গীতিকা, মঙ্গল-গান, বৈষ্ণব-গীতিকা ইত্যাদি। ক্রান্তি-পর্বের কবিওয়ালাদের সাহিত্য-কর্ম ভাবময় সংগীত। পার্থক্য শুধু এগুলো কোন দেব-আখ্যান নয়; প্রেম ভাবের কিম্বা ভক্তিভাবের খণ্ড কবিতা। বৌদ্ধ শ্রমণদের রচনা-গুলোও খণ্ড কবিতা, বৈষ্ণব-গীতিকাও তাই। বাংলা কবিতার পূর্ব-কাব্যাদর্শের কোন বিশেষ ভাবানুষঙ্গের আবেগে ব্যক্তিক অনুভূতি অনুক্রম-বিযুক্ত পৃথক পৃথক রসচিত্র বলে কবি-ওয়ালাদের গানকেই

কেবল স্বতন্ত্রভাবে কবি-গান বা কবি-সঙ্গীত বলে বিচ্ছিন্ন করা হলে শুধু কবিওয়ালাদের গান সম্পর্কেই নয়, বাংলা কবিতার ঐতিহ্যিক বিবর্তন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। অতএব কবিওয়ালাদের সংগীত, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'ভক্তিমূলক গান' ও 'প্রণয়-সংগীত'[২৬]-রূপে অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 'কবিগান', পাঁচালী, টপ্পা, খেউড়, আখড়াই ইত্যাদির মত ভক্তিমূলক বা প্রণয়-সংগীতের স্বতন্ত্র শাখা-রূপে উল্লেখনীয়।

ভবানী বিষয়ক ভক্তিমূলক গান এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক প্রণয়-সঙ্গীত রচনায় কবিওয়ালারা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় বা পরম-তত্ত্বের অনুসারী ছিলনা। কোন বিশেষ ধর্মাভিমানেও তারা কৌতূহলী বা আবেগগ্রস্ত ছিলনা। তবে ভবানীর প্রতি ভক্তিমূলক করুণ আবেদন-নিবেদন এবং প্রেম বিষয়ক সংগীত রচনায় তাদের আগ্রহ-আবেগ-অনুভূতিতে আন্তরিকতার অভাব ছিলনা। গ্রামীণ সরলতার সাহজিক আন্তরিকতার সঙ্গে নতুন বেনিয়া নাগরিক-ঢঙের মিশ্রণে ভাষা অনেকটাই ভঙ্গিমাযুক্ত। ফলে সর্বশ্রেণীর শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তারা কেবল কবিওয়ালা,—বলা উচিত পরম-প্রিয় কবিওয়ালা এবং কবি-ওয়ালা ব্যতীত তাদের অপর কোন দেব-ধর্ম বা তত্ত্বযুক্ত সাম্প্রদায়িক পরিচয় ছিলনা।

পাঁচ

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক সমালোচকদের প্রায় সকলেই কবি-ওয়ালাদের সংগীত-সাধনা সম্পর্কে অল্পাধিক আলোচনা করেছেন এবং অধিকাংশ সমালোচকই তাদের সংগীত-সাধনা সম্পর্কে খুব-একটা প্রশংসনীয় অভিমত ব্যক্ত করেননি। তার অন্যতম কারণ, সম্ভবত, তাদের সংগীতে গ্রামীণ অসাধু-ভাষার স্বেচ্ছাচারী, শিথিল সংযুক্তি ও অশোভন কটূক্তি, উপস্থাপনার কাকতালীয় ভঙ্গি এবং ছন্দ-রীতির প্রতি অমনোযোগিতা ইত্যাদি। তবে মনে হয় অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত স্বভাব-পটু গ্রাম্য-কবি কর্তৃক সহজ-সরল গ্রামীণ অসজ্জন ভাষায় রচিত বলেই আধুনিক সমালোচক কর্তৃক কবিওয়ালা ও তাদের সংগীত অবজ্ঞার্থে আলোচিত। কবিওয়ালা রচিত এমন বহু সংগীত আছে

যেগুলোর গীতি-মাধুর্যের লালিত্যে, ভাবগাম্ভীর্যের মহিমায় ও আন্তরিকতায় কবি-ওয়ালাদের মহৎ কবি-মানসতারই পরিচয় বহন করে এবং শ্রোতৃমণ্ডলী ও পাঠক-চিত্ত তাদের অনেক সংগীতেরই বিশুদ্ধ রস-মাধুর্যে সহজেই আকৃষ্ট ছিলেন। আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে সুশীলকুমার দে,[২৭] নিরঞ্জন চক্রবর্তী[২৮] এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায়[২৯] কবি-ওয়ালা ও তাদের রচিত সংগীত সম্পর্কে গঠনমূলক সঙ্গত মূল্য নিরূপণের প্রয়াস গ্রহণ করেছেন।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই একমাত্র সমালোচক যিনি কবি-ওয়ালা ও কবিওয়ালা-রচিত সংগীত সম্পর্কে খুব কঠিন, এবং অকরুণ মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং তাদের সংগীতের কোনরূপ সৌন্দর্যই তিনি অনুভব করেননি। অবশ্য, তা' কবির একান্ত ব্যক্তিগত রুচি-বৈষম্যের ব্যাপার। কিন্তু ভাবতে খুবই বিস্ময় বোধ হয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত একজন অতি দুর্লভ দৃষ্টিক্ষম প্রতিভার অধিকারী সুমহৎ মানবতা-বাদী কবি কবিওয়ালাদের আবির্ভাবকে 'অকস্মাৎ' এবং তাদের কবিতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'সর্ব-সাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেছেন।[৩০] একথা অবশ্যই স্বীকার্য বাংলা কাব্যের 'একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে'ই[৩১] কেবল নয়, বরং সায়াহ্নকালী অকস্মাৎ আপৎকালেই তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং জাতীয়-জীবনের দুঃসময়ে কবি-সাহিত্যিকদের হঠাৎ আবির্ভাবের ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বিরল নয়। কিন্তু 'সর্ব-সাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি' তাদের 'আশ্রয়দাতা' এবং কবি-ওয়ালাদের 'অকস্মাৎ' আবির্ভাবের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ খুব দুর্বোধ্য ছিলনা। সন্দেহ হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি তা'হলে সাহিত্যানুশীলনে এবং তার রসাস্বাদনে নিম্ন-শ্রেণীর সাধারণ মানুষের অধিকার স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন! কিন্তু তিনিই আবার অন্য প্রবন্ধে মুক্তকণ্ঠে লোক-সাহিত্যের প্রশংসা করেছেন। কবি-ওয়ালাদের ভক্তিমূলক গান ও প্রণয়-সংগীত সম্পর্কে উক্তরূপ একদেশদর্শী অনুদার মন্তব্য খুবই অবোধগম্য মনে হয়। কারণ অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত অতি সাধারণ কবি-ওয়ালাদের ভাষার অবিশুদ্ধতা, ছন্দের শিথিল-বদ্ধতা, শিল্পে-সৌন্দর্যের অনভিজ্ঞতা এবং উপস্থাপনার গ্রাম্য-দুষ্টতা খুবই স্বাভাবিক এবং প্রণয়-সংগীতের স্রষ্টা-শ্রোতার আবির্ভাব যত অপ্রত্যাশিত এবং নিম্ন শ্রেণীরই হোক,

কোন দেশেরই কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব এবং তাদের সাহিত্য-সাধনা দেশ-কাল ও দৈশিক কাব্যানুক্রমের ঐতিহ্য-রহিত হয় না, কবি-ওয়ালাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে সাহিত্যানুরাগী-চিত্তের আবেগ-অনুভূতির বেদনা যদি অচলায়তন-বদ্ধ হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যদি তা' বহু-শতক অবধি অবদমিত থাকে, তবে যে কোন অবকাশেই তার বহির্প্রকাশ হঠাৎই ঘটে থাকে। এরূপ বহির্প্রকাশ যেমন অনেক সময়ই অস্বীকৃত সমাজের রুচি-অভিজ্ঞতা-বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী অসংস্কৃত ও ত্রুটি পূর্ণ হয়ে থাকে, তেমনি আবার নতুন সুদূরগামী সম্ভাবনার দ্বারও উন্মুক্ত করে দেয়। কবি-সংগীতে, অনেক ত্রুটি-সত্ত্বেও, সে সম্ভাবনার আভাস অনস্বীকার্য। দেশের একটা অপ্রত্যাশিত দুঃসময়ের সুযোগে কবি-ওয়ালাদের আবির্ভাব হলেও তার একটা কারণ-সম্পর্ক অবশ্যই আছে এবং তা বাংলা কবিতার মৌলিক স্বভাব ও ঐতিহ্য-রহিত নয়।

দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, মধ্যযুগে বাংলা কাব্য উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির এক অতি উজ্জ্বল, সুমহৎ ঐতিহ্যে পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগ ছিল নবাব-সুলতান, রাজা-ভূস্বামী, জমিদারদের ঐশ্বর্যময় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আড়ম্বর-আভিজাত্যের সামন্ত যুগ। তখন কাব্য-চর্চা, কাব্যানুশীলন এবং তার পাঠ-পঠন, লালন-পালন আস্বাদন-আয়োজনে সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল রাজা-ভূস্বামী-জমিদার কিম্বা কোন ধর্ম-গুরু বা দেব-প্রভাবিত সম্প্রদায় বিশেষের এখতিয়ার ভুক্ত। বিদ্বজ্জন-সুলভ পরিষদবেষ্টিত রাজা-ভূস্বামীর সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে কিম্বা ধর্ম-গুরুবাদী বা দেব-মাহাত্ম্য-বাদী সম্প্রদায় বিশেষের আবেষ্টনীতে সুমহৎ কবি বা কবি-সম্প্রদায় কর্তৃক উন্নত ভাষায় রচিত এ সময়ের সমস্ত কাব্য-কবিতাই ছিল উচ্চ-মার্গের দেব-প্রশস্তি কিম্বা পরমাত্মা সম্পর্কিত কোন জটিল-তত্ত্ব বিষয়ক। এসব কাব্য-কবিতার মাহাত্ম্য অবধারণে কিম্বা রসাস্বাদনে, ভারতচন্দ্রের ভাষায়, 'তপ জন নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর'[৩২] শ্রেণীর অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত জন-সাধারণের কোন ক্ষমতা তো ছিলইনা, অধিকারও খুব একটা ছিলনা। মধ্যযুগীর সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জমিদার কিম্বা নেতৃস্থানীয় সম্পদশালী সমাজ-পতি বা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম-গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেবানুগ্রহ-প্রাপ্তি বা পুন্য সঞ্চয়ের নামে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে এই সব

উচ্চ-মহিমার কাব্য-কবিতা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, ধর্ম-ভীরু জন-সাধারণের সমক্ষে পরিবেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হতো। সুমহৎ কবির ভাষায় লিখিত, সামন্ত সমাজ কর্তৃক আয়োজিত, সুগায়ক কর্তৃক গীত এসব উচ্চাঙ্গের দেব-প্রশস্তির সংগীত সম্পূর্ণ বোধগম্য না হলেও, বিপদে-আপদে, দুঃখ-দুর্দশায় কেবল পুণ্য ও দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় বাংলার অসহায়-অশিক্ষিত প্রজাবৃন্দ সমগ্র মধ্যযুগ-ব্যাপী পরম শ্রদ্ধায় এই সব দেব-মহিমা ও কঠিন তত্ত্বের সংগীত শ্রবণ করেছে। কিন্তু নিদারুণ হতাশা ও বেদনার সঙ্গেই তারা উপলব্ধি করেছে, এই সব দেব-মাহাত্ম্যের মঙ্গল-গান যাঁরা লেখিয়েছেন, লিখেছেন এবং সাধারণের পুণ্যের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, দেবতার কৃপায় কেবল তাঁরাই দিনের পর দিন ফুলে-ফেপে উঠেছেন, আর তাঁদের নিজেদের ভাগ্যে দেবতার অনুগ্রহ তো দূরের কথা, বরং দেবতা যেন ক্রমশঃই তাদের প্রতি ক্রূর হতে ক্রূরতর হয়ে উঠেছেন। ফলে এই সব উচ্চ-দেব মাহাত্ম্যের মঙ্গল গান বা তত্ত্বীয় সংগীতের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস দিনের পর দিন ক্রমশঃই হ্রাস পেয়েছে। অপর দিকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, অভাব-অনটন, ব্যক্তিক আবেগ-অনুভূতি ও মন-মানসতার অব্যক্ত, অবরুদ্ধ বেদনা নিজেদের প্রাণের ভাষায় অন্তর্যামী দেবতার চরণে নিবেদনের ব্যাকুলতায় সমস্ত হৃদয়-মন ক্রমশঃই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে এবং এটাই স্বাভাবিক।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপর্যস্ত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজকীয় মধ্যযুগের আড়ম্বরপূর্ণ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যানুশীলনের পোষক ও লালনকারী অভিজাত সামন্ত প্রভু এবং তাদের অনুপ্রাণিত ও অনুগৃহীত মহৎ কবি-সাহিত্যিকেরা যখন ঘনায়মান অন্ধকারে কোথায় সব উবে গেল ঠিক তখনই অকস্মাৎ নয় খুব স্বাভাবিক ভাবেই দিঘির বৃহৎ মৎস্যের অন্তর্ধানে ক্ষুদ্র মৎস্যসমূহের আনন্দোৎসবের মতো বহু শতাব্দীর অচলায়তন-বদ্ধ, অতৃপ্ত সাহিত্য-পিপাসা নিবৃত্তির অভিলাষে বাংলার শূন্য সাহিত্যাঙ্গনে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কবিওয়ালাদের আবির্ভাব ঘটে। বাংলা কবিতার মৌলিক স্বভাব—ধর্মকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত না করে কবিওয়ালাদের সংগীত একাধিক লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যে কেবল অভিনবই নয়, আধুনিক বাংলা

কবিতার সম্ভাবনায় কয়েক ধাপ অগ্রসরমানও বটে। ভক্তিমূলক সংগীতে সম্ভবত রামপ্রসাদ সেনই প্রথম, যিনি শাক্ত হয়েও সম্পূর্ণ মুক্ত মানসিকতায় বিশ্ব-প্রকৃতির মূলীভূত পরমা-প্রকৃতি আদ্যাশক্তিকে মধ্য-যুগের আখ্যান-মূলক উগ্র-চণ্ডী, শান্তোগ্র-চণ্ডী, মঙ্গল-চণ্ডী রূপ ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তি-বিযুক্ত একক সত্তা রূপে একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতির উপ-স্থিত আকাঙক্ষার প্রেরণায় স্বল্পায়তনের বিশ্লিষ্ট বহু ভক্তিমূলক গানের রচয়িতা। প্রসঙ্গত তাঁর বিখ্যাত 'দে মা আমায় তহবিলদারী' গানটি স্মর্তব্য এ কারণে যে, ভক্তির সঙ্গে বৈষয়িক আকাঙক্ষা যুক্ত হয়ে বাস্তব ধর্মী আবেদনের জীবন-ঘনিষ্ঠ সংবেদনায় গানটি হৃদয়িক হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্য রচয়িতাদের বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলের প্রবেশক সংগীতগুলোতে এরূপ ভক্তিমূলক গানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেগুলো আখ্যানমূলক কাহিনী-সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রচিত। পরবর্তীতে কবি-ওয়ালারা বিশেষ-ভাবে রামপ্রসাদের অনুসরণেই মধ্যযুগের বিভিন্ন দেব-দেবীর স্থলে পরমা-প্রকৃতি আদ্যা-শক্তির এককত্বের প্রতি-রূপে ভগবতী তথা ভবানীকে মাতৃরূপে সম্বোধন করে নিজ নিজ জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙক্ষা, আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে বৈষয়িক আবেদন-নিবেদনসহ খণ্ড খণ্ড বহু আগমনী ও ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন এবং এসব গানে উপস্থিত ব্যক্তিক অনুভূতিটাই ছিল প্রেরণার প্রধান উৎস।

ছয়

কবি-ওয়ালাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বহুল আলোচিত কবি-কৃতি রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক প্রণয় সংগীত। কবিওয়া-লাদের যত খ্যাতি-অখ্যাতি তার অধিকাংশটাই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রণয় সংগীতগুলো নিয়ে। সাহিত্যের ইতিহাসে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলার কাহিনী অতি প্রাচীন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'ই সম্ভবত রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক প্রাথমিক আখ্যান-ধর্মী কাহিনী-কাব্য। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনই এ পর্যন্ত রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় লীলা বিষয়ক প্রথম কাহিনী-কাব্য। অতঃপর রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কে অবলম্বন করে চৈতন্যদেবের জীবাত্মা-পরমাত্মা

তত্ত্বীয় বৈষ্ণব-দর্শন তথা বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব ঘটে, বাংলা কাব্যের গৌরব ও সমুন্নতি সম্পাদনে তত্ত্বাশ্রয়ী বৈষ্ণব-গীতিকার প্রশংসনীয় সংযোজন পাঠক মাত্রই বিদিত। সমকালে বৈষ্ণব-গীতিকা যে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, এখনও যে তার এত গৌরব, তার কারণ বৈষ্ণব-তত্ত্ব নয়,—তার প্রণয়ানুভূতি। কেননা, প্রণয় মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছিন্ন মৌলিক উপাদান। মধ্যযুগের 'তপ জপ ধ্যান জ্ঞান' হীন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তো অবশ্যই, এমনকি জ্ঞানী-গুণী মানুষের চিত্তও তত্ত্বাশ্রয়ী বৈষ্ণব প্রণয়-সংগীত ইহ-জৈবনিক মানবীয় প্রেম-রসের অঙ্গহীনতার অতৃপ্তি-জনিত বেদনায় উৎকণ্ঠিত ও উৎকর্ণ ছিল বরাবরই। এমনকি বৈষ্ণব পদকর্তারাও মানবিক প্রণয় রসাস্বাদনের মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন না। বাংলা-কাব্যের ক্রান্তি-পর্বের অশিক্ষিত, নিন্দিত কবি-ওয়ালারাই সর্ব প্রথম একটা ভিন্ন ধারার আধ্যাত্মিক ভাবাশ্রয়ী জীবাত্মা-পরমাত্মা-রূপ জটিল তত্ত্বের প্রণয় থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করে মানবীয় প্রেমের একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতির জীবন-ঘনিষ্ঠতায় সংগীতাশ্রয়ী কবিতা রূপে উপস্থাপিত করেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-লীলা বিষয়ীভূত কবি-ওয়ালাদের ব্যক্তিক ও উপস্থিত অনুভূতির খণ্ড খণ্ড বিশ্লিষ্ট প্রণয় সংগীতগুলোতে রাধা-ভাব প্রায়শঃ অনুপস্থিত নয়। কিন্তু রাধা যে প্রণয়-সংগীতগুলোর কোন মুখ্য চরিত্র বা বিষয় নয়, সংগীতগুলো নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করলে তা অনায়াসেই অনুধাবন করা যায়। বৈষ্ণব-গীতিকায় শ্রীরাধা যেখানে পরমাত্মার সম্পর্কে জীবাত্মার প্রতীকরূপে কল্পিত, সেখানে প্রণয়-সংগীতগুলোতে রাধা কবি-ওয়ালাদের ব্যক্তিক ও ইহ-জৈবনিক প্রেমানুভূতির নায়িকার প্রতীকে উপস্থাপিত এবং মানবীয় প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি ও রসাবেশের ব্যাখ্যান-রূপে প্রণয় সংগীতগুলোকে মহড়া, চিতেন, অন্তরা ইত্যাদি বিভাজক বৈশিষ্ট্যে আস্বাদনীয় করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। অভিনিবিষ্ট পাঠক মাত্রই অবগত আছেন, অধিকাংশ প্রণয়-সংগীতেই রাধাভাস অনুপস্থিত। তবে প্রেম-বিরহের সহমর্মীরূপে সখির উপস্থাপনা আছে এবং মানবীয় প্রেমানুষঙ্গে তা' খুবই স্বাভাবিক।

কোন কোন সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রণয়-সংগীতগুলো সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ খুবই প্রবল। কিন্তু অকুণ্ঠিত ও উদার-চিত্ত পাঠক-সমালোচক মাত্রই স্বীকার করবেন, জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ', বড়ু

চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' এবং ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যা-সুন্দরে'র সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে কবি-ওয়ালাদের প্রণয়-সংগীতের অশ্লীলতা অনুল্লেখ্য। তবে মনে হয়, ভাষার অসাধু গ্রাম্য দুষ্টতা এবং কবি-সংগীতের ব্যক্তিগত আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণে কটূক্তির আশোভন ভাষা-দৃষ্টে কোন কোন কুণ্ঠ-চিত্ত অনুদার সমালোচকের নিকট প্রণয়-সংগীত অশ্লীল বিবেচিত হয়ে থাকবে।

কবি-ওয়ালাদের প্রণয়-সংগীতগুলো প্রসঙ্গে বাংলা কাব্যের ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে কৌতূহলী কিম্বা কাব্যামোদী যে-সব পাঠক অল্পাধিক অবহিত কিম্বা কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনা পাঠ করে বীতশ্রদ্ধ, সে-সব পাঠকের নিকট উপর্যুক্ত বক্তব্যের যৌক্তিকতার নিদর্শন স্বরূপ এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায়, সুযোগের অভাব সত্ত্বেও, প্রণয়-সংগীতের কয়েকটি নির্বাচিত চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

ক. সখি,এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয়॥
সুহৃৎ ভঞ্জনো, লোক গঞ্জনো,
কলঙ্ক ভাজনো হোতে হয়। [মহড়া]
এমনো পীরিতি করি, যাতে তরি দু'দিকেরি,
ঐহিকো আরো পাথিকো॥[৩৩] [চিতেন]

খ. বুঝেছি মনেতে।
রমণীর প্রেম কেবল ধন।
মিছে মিছি সে মিলন॥
তাদের ধন লোয়ে কথা,
পীরিতি বা কোথা,
কাকস্য পরিবেদনা। [মহড়া]
যদি হৃদয় চিরে প্রাণ নারীরে কর সমর্পণ
তবু কেমন চরিতো, তাহে কদাচিতো,
নাহি পাওয়া যায় মন॥[৩৪] [চিতেন]

গ. একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুঃখে জ্বালাতন॥ [অন্তরা]
শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়।
সে জন্যে তাহার, ফিরে নাহি চায়॥

তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ ॥ [চিতেন]
সখি, পীরিতি পরম ধনো, জগতেরি সার।
সুজনে কুজনে হোলে, হয়ো ছারে খার ॥[৩৫] [অন্তরা]

ঘ. হায়, পীরিতেরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভো মম অঙ্গে রয়।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসো,
ব্যালিলো জগতময়।[৩৬] [চিতেন]

ঙ. যৌবন জনমের মত যায়।
সে তো অশা-পথ নাহি চায় ॥
কি দিয়ে গো প্রাণসখি, রাখিব উহায় ॥
জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্বার ॥
বাঁচি তো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায় ॥[৩৭] [মহড়া]

চ. মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায়গো সে,
তারে বলি বলি, আর বলা হোলনা ॥
সরমে মরমের কথা কওয়া গেলনা,
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে।
নিলজ রমণী বোলে, হাসিতো লোকে।
সখি ধিক থাক আমারে,
ধিক সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করেনা।[৩৮] [মহড়া]

লক্ষণীয় কবি-ওয়ালাদের প্রেম-চেতনা কেবল ভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, ত্যাগেও তাদের সংগীত বিশ্বলোক তথা ভাবলোকের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত দু'টি সংগীতে (ক, ঘ) আধুনিক রোমান্টিক গীতি-কবিতার পূর্বাভাস পরিস্ফুট। প্রণয় সংগীতগুলোতে এ জাতীয় সংগীত খুব কম নয়। আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, যে, বাংলা কবিতার স্বভাব-ধর্ম ও ঐতিহ্য-বিচ্যুত মাত্র একজন উল্লেখ-যোগ্য কবি-ওয়ালার ব্যতিক্রম ব্যতীত কবি-ওয়ালা-কৃত সমস্ত সৃষ্টিই গান কিংবা সংগীত, কবিতা নয়।

১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অন্তর্বর্তীকালীন বাংলা কবিতার ক্রান্তি-পর্বে রচিত শায়েরদের কাব্য-কবিতার মতই বাংলা কবিতার ঐতিহ্যিক ক্রম-বিকাশের একাধিক বিবেচনায় এই সব গান ও সংগীতের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। স্মর্তব্য, মধ্যযুগের সমস্ত সৃষ্টিই প্রগানুগত ছন্দোবদ্ধ কবিতা, গান বা সংগীত নয়। এমন কি দেব-প্রশস্তির কাব্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্যের সংশ্লিষ্ট গীতগুলোও প্রথাবদ্ধ ছন্দে রচিত। অর্থাৎ মধ্যযুগের সমস্ত কাব্য-কবিতা, গীত-গীতিকাই কবিতার শাস্ত্রীয় বিধি-মতে ছন্দের নিগড়ে আবদ্ধ, গান বা সংগীতের মতো স্বাধীন নয়। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী কবিতা ও সংগীতের নির্মাণ-কৌশলের পার্থক্য স্বীকৃত। কবিতাকে যথার্থ অর্থে কবিতা হতে হলে পদান্তে কিম্বা পদ-মধ্যে অথবা শব্দ-ধ্বনি বা ভাবানুষঙ্গী শব্দের স্বরাঘাতে পর্ব, মাত্রা, যতি, ছেদ ইত্যাদির বিধি-বদ্ধ অনুমতে কোন না কোন ভাবে কবিতাকে ছন্দাশ্রয়ী হতেই হবে, পাঠে, শ্রুতিতে একটা ঐক্য বা সঙ্গতিকে নিশ্চিত করতেই হবে। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্র-ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য-ছন্দ। কিন্তু কবিতার মত গান বা সংগীতের জন্য ছন্দ অত্যাবশ্যক নয়। কবিতার ছন্দের মত সংগীত বা গানে স্বর-তরঙ্গপ্রবাহই হচ্ছে প্রধান, সংগীতের চরণের জন্য ছন্দ অপরিহার্য নয়, অপরিহার্য সুর-প্রবাহের কড়ি-মধ্যম-কোমল ইত্যাদির অনুষঙ্গী তাল, লয়, মাত্রা-সঙ্গত শব্দ নির্বাচন। তবে তা' ছন্দোবদ্ধও হতে পারে, ছন্দমুক্তও হতে পারে। তবে সুর বা স্বর-তরঙ্গের কিম্বা ধ্বনির সঙ্গের তাল-লয়-মাত্রা-সমের ঐক্য বা সঙ্গতি অপরিহার্য এবং তা ছন্দ ব্যতিরেকেও হতে পারে। কবিতার জন্য যেমন ছন্দ, সংগীতের জন্য তেমন তাল-লয়-মাত্রা নির্ভর সমন্বিত সুর-ধ্বনি অপরিহার্য। তাই কবিতা মাত্রই সংগীত নয়, কিন্তু অপরদিকে সংগীত হলে তাকে কবিতা হতেই হবে এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। সংগীত কবিতা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীন, বলা যেতে পারে, মুক্ত।

মধ্যযুগের যে কোন কাব্য-কবিতা, তা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বা অনূদিত রামায়ণ-মহাভারত কিম্বা চরিতাখ্যানই হোক, সংগীতের বিধি অনুযায়ী না হলেও, ভাবপ্রবণ সংগীতবিলাসী মধ্যযুগের বাঙালী পাঠক শ্রোতা তাকে কোন না কোন প্রকারে গানের ভঙ্গিতে শ্রবণ করতেই

ভালবাসতেন। তাতে এক প্রকার শ্রুতি-সুখদ আনন্দ অনুভব করতেন বটে, কিন্তু মধ্যযুগের গতানুগতিক ছন্দোবদ্ধ কবিতার মত সে গানেরও একঘেয়ে প্রথাবদ্ধতা ছিল, সুর বা স্বরের স্বাধীনতা ছিলনা এবং তার কোন উপায়ও ছিলনা। কিন্তু ক্রান্তি-পর্বের অশিক্ষিত, অসংস্কৃত, অমহৎ কবি-ওয়ালাদের ভক্তি-মূলক গান এবং প্রণয়-সংগীতের ভাষা ও সংগঠনগত দুর্বলতা, গ্রাম্য দুষ্টতা ও ছন্দ-ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও তার সংগীতত্ব সম্পর্কে অবশ্যই কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এবং সে সংগীতের তাল, লয়, সুরের স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য, শ্রুতি-মাধুর্যও অবশ্যই স্বীকার্য। নতুবা, অপকৃষ্ট ভাষায় রচিত হয়েও সংগীতগুলো সর্ব-শ্রেণীর শ্রোতার নিকট এত সমাদৃত হবে কেন। বস্তুতঃ কবি-ওয়ালারাই বাংলা গান বা সংগীতকে তাল, লয়, ভাব ও সুরের মুক্ত, স্বাধীনলোকে প্রতিষ্ঠাতা প্রথম গীতিকার।

দ্বিমতের অবকাশ নেই যে গীত থেকেই গীতি-কবিতার জন্ম। কোন বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করে কবির একান্ত অনুভূতি যখন গীত বা সংগীতের আবেগময়তায় ছন্দায়িত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই তা হয়ে উঠে গীতি-কবিতা। সংক্ষেপে, গীত ও কবিতার সমন্বয়ই গীতি-কবিতা। এই গীতি-কবিতা থেকেই আধুনিক রোমান্টিক গীতি-কবিতার জন্ম। প্রসঙ্গতঃ, ইংল্যাণ্ডে আধুনিক রোমান্টিক গীতি-কবিতার সূচনাতে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের *Lyrical Ballads* কাব্য-গ্রন্থটির প্রকাশ স্মর্তব্য।[৩৯] বাংলা কবিতার ক্রান্তি-পর্বের কবি-ওয়ালাদের এমন অনেক প্রণয়-সংগীত আছে যে-গুলো আধুনিক বাংলা রোমান্টিক গীতি-কবিতার ভাব ও অবয়ব সংগঠন থেকে খুব বেশী দূরবর্তী নয়। তাদের অনেক সংগীত কেবল সংগীতই নয়, কোথাও কোথাও সুখ-পাঠ্য কবিতাও হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত কয়েকটি সংগীতে তা লক্ষ্যযোগ্য। সাক্ষাৎ প্রমাণ স্বরূপ আর একটি প্রণয়-সংগীত পাঠকের প্রণিধানের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হল :

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ
বদন ঢেকে যেওনা।
তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা দেখতে চাই,

কিছু থাকে। থাকে বোলে
ধোরে রাখবনা।
আমি কোন দুঃখের কথা।
তোমায় বলব না॥
তুমি যাতে ভালো থাকো সেই ভালো।
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ,
আমারি গেলো॥
সদা রাগে কর ভর,
আমি তো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায়,
দুঃখ দিওনা॥[৪০]　　[মহড়া]

বাহ্যতঃ ছন্দোবদ্ধ না হলেও, কবিতাটি পাঠে মনে হয়, শব্দের স্বাচ্ছন্দ্যে এবং ভাষা-ভঙ্গির আন্তরিকতায় ছন্দের অসদ্ভাব শ্রুতিতে খুব একটা বাধেনা।

সংগীত বা কবিতাকে কবির ব্যক্তিক ও হৃদয়জ সম্পদ-রূপে উপস্থাপনায় কবিওলাদের সাহসিক ভূমিকা বা প্রয়াস বাংলা কবিতার বিবর্তনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান-রূপে স্বীকৃতির যোগ্য। কবিতা কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তি-বিশেষের মতামতের মুখাপেক্ষী নয় এবং বিষয় নির্বাচনেও কবির অধিকার সার্বভৌম। কবিতা একান্তভাবেই কবির নিজস্ব, সম্পূর্ণ অন্তরস্থ চিন্তা-চেতনার ফসল,—এ মহাসত্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কবি-ওয়ালারাই প্রথম গ্রহণযোগ্য করে পাঠক শ্রোতার সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। 'ব্যক্তির মুহূর্তের ইচ্ছা অনুবর্তী'[৪১] বলেই সাহিত্যের ইতিহাসকার যথার্থেই কবি-ওয়ালাদের যুগকে 'আধুনিক বাংলা কাব্যের জীবন-ভূমি'[৪২]-রূপে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। স্মর্তব্য, ব্যক্তির মুহূর্তের অনুভূতির ছন্দোবদ্ধ গীতাত্মক বহির্প্রকাশই আধুনিক রোমান্টিক গীতি-কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শায়ের ও কবি-ওয়ালা—এই দু'শ্রেণীর কবি-দলই বাংলা কবিতার ক্রান্তি-পর্বের কাব্য-কবিতা ও সংগীতের একমাত্র সাধক। উভয় দলের কাব্য-কবিতা এবং সংগীত সম্পর্কে ইতিপূর্বের বিশ্লেষণে অবশ্যই লক্ষ্যকৃত হয়েছে যে এই দু'শ্রেণীর কবি-দলের কাব্য-সংগীত অনুশীলনের

আকার-প্রকার, ভাব-ভঙ্গি, ভাষা-রীতি, ছন্দানুবর্তিতা, দৃষ্টিকোণ ও মন-মানসিকতার কোন দিক থেকেই সামান্যতম সাজুয্যও নেই এবং প্রসঙ্গতঃ তার কার্য-কারণ-সম্বন্ধও নির্দেশ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশের জন্য একটা অনিশ্চিত কালের পীড়াদায়ক দুঃসময়ের সূচনা-লগ্নে যেখানে শায়েরদের কাব্য-কবিতায় একটা বিক্ষুব্ধ-মনস্কতা লক্ষ্যযোগ্য, সেখানে কবি-ওয়ালারা পরম নিশ্চিন্তে ও মহানন্দে ভক্তিমূলক গান ও প্রণয়-সংগীত রচনার উল্লাসে মত্ত এবং দেশের একটা বিরূপ অসহনীয় অবস্থা-ন্তরের জন্য সামান্যতম ক্ষোভ বা বিন্দুমাত্র নৈরাশ্যের এতটুকু আভাস প্রচ্ছন্নভাবেও তাদের সংগীত চর্চায় প্রকাশ পায়নি, বরং একটা হৃষ্ট-চিত্ত প্রশান্ত মানসিকতার পরিচয়ই সুস্থিরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কবি-ওয়ালাদের সংগীতে এ প্রসন্নতার কারণ প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ না পেলেও একেবারে অবোধ-গম্য ছিলনা। কবি-ওয়ালাদের সংগীত সাধনায় বাংলা কবিতার একাধিক সম্ভাবনাময় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, উক্ত লক্ষণ-দৃষ্টে ভবিষ্যৎ বাংলা কবিতার একটা বিসদৃশ মানসিকতার অশুভ সঙ্কেত অস্পষ্ট ছিলনা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা কবিতার মানব-সত্য ও ভাবাত্মক বাংলা কবিতার গীতিময়তার ঐতিহ্য-বিচ্যুত কবিওয়ালাদের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠতম উত্তরসূরি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় সে অশুভ সঙ্কেত দিবালোকের মত প্রত্যক্ষীভূত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।[৪৩] কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যুগ ও কবিতা আলোচনায় সে প্রত্যক্ষীভূত অশুভ সঙ্কেতের স্বরূপ নিরীক্ষণে অবশ্যই সম্যক প্রয়াস গ্রহণ করা হবে।

তথ্যসঙ্কেত

১ শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ : নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, নিউ এজ সংস্করণ-ভাদ্র, ১৩৬২, পৃ. ৯৩

২ Azizur Rahman Mallick : British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856, Second Edition : 1977. (Bangla Academy, Dacca), pp. 3-132

৩ মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ-১৩৭১, পৃ. ৫-৬, ৯-১০

৪ বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১, ১৯৭৩, পৃ. ৯৬-১৪২

৫ মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান (অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে) : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিরচিত : মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ. ৪২ (সমস্ত কাব্যটি দ্রষ্টব্য)

৬ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৩৪৭/১৯৪০, পৃ. ৯২৪-৯৩৬

৭ মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান : ঐ, পৃ. ২৩-৩৪

৮ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : সংসদ অভিধান, সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা-৯, ১৯৭১, পুনর্মুদ্রণ-১৯৭৩, পৃ. ৫২৭

৯ আনিসুজ্জামান : মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭১/১৯৬৪, পৃ. ১১৯

১০ আনিসুজ্জামান : ঐ, পৃ. ১১৯

১১ সুকুমার সেন : ঐ, সূচী দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৶.

১২ আনিসুজ্জামান : ঐ, পৃ. ১১৭

১৩ আনিসুজ্জামান : ঐ, পৃ. ১১৬

১৪ মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান (অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে): ঐ, পৃ. ৪২

১৫ সুকুমার সেন : ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য, ১৯৫১, ইস্টার্ন পাবলিশার্স কলিকাতা-৯, পৃ. ৪৯

১৬ আনিসুজ্জামান : ঐ, পৃ. ১১৫

১৭ সুকুমার সেন : 'ইসলামী সাহিত্য', ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯, শিরোনামে দ্র. অথবা মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান : ঐ, পৃ. ১৩১

১৮ S. K. Dey : History of Bengali Literature in the 19th Century, 1800-1825, Calcutta-1919, 'Love Lyrics' এবং 'Devotional Song' শিরোনামা দ্রষ্টব্য। পৃ. ৩৮৭, ৪১১

১৯ Muhammad Shahidullah : *Buddhist Mystic Songs*, Renaissance Printers, Dacca, Reprinted : June, 1974. শিরোনামা স্মর্তব্য।

২০ S. K. DEY : Ibid. Chapter X, P. 302

২১ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড-মধ্যযুগ) রেনেসাঁস্ প্রিন্টার্স, ঢাকা-১, প্রথম সংস্করণ-১৩৭১, পৃ. ৬৬-৭৪, ১২৩-৪২, ২২০-২২, ৩২১-৪২১

২২ সুকুমার সেন : ইসলামী বাংলা সাহিত্য, ঐ, পৃ. ৪৫

২৩ মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান (অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে) : ঐ, পৃ. ৬৮-৭১

২৪ মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান : ঐ, পৃ. ১৩১-৮০

২৫ শিবনাথ শাস্ত্রী : ঐ, পৃ. ৫৭

২৬ S. K. DEY : Ibid. p. 387, 411

২৭ Ibid.

২৮ ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য : নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭

২৯ আধুনিক বাংলা কাব্য : প্রথম পর্ব : তারাপদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা-১২, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৩৭৭, পৃ. ১৬-২৬

৩০ লোক সাহিত্য, কবি-সংগীত : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৪৭-শ্রাবণ, পৃ. ৬৩২-৬৩৮

৩১ লোক সাহিত্য, ঐ, পৃ. ৬৩২-৩৩

৩২ মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান (অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে), ঐ, পৃ. ১৬

৩৩ নিরঞ্জন চক্রবর্তী : কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৭, প্রথম সংস্করণ, ১৮৮০ শকাব্দ, পৃ. ১৬৬

৩৪ ঐ, পৃ. ১৮৪

৩৫ ঐ, পৃ. ১৮৫

৩৬ ঐ, পৃ. ১৮৭

৩৭ ঐ, পৃ. ২২৬

৩৮ ঐ, পৃ. ২২৮

৩৯ সাহিত্য-সন্দর্শন : শ্রীশচন্দ্র দাস, কলিকাতা-৯, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃ. ১৯৫

৪০ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ঐ, পৃ. ২৫২

৪১ শ্রীভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা [দ্বিতীয় পর্যায়], দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬, পৃ. ২৮

৪২ নিরঞ্জন চক্রবর্তী : ঐ, পৃ. ১৯

৪৩ আধুনিক বাংলাকাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১লা আষাঢ়, ১৩৭৭, পৃ. ২১১-৩০